মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত

জন্ম - ১৯ শে মে ১৯০৮ / মৃত্যু - ৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৬

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছিল। জীবৎকালে তখনকার ছাত্র যুব সম্প্রদায়ের কাছে তিনি ছিলেন নয়নের মণি। তাঁর তেজ, জেদ, দৃঢ়তা, ব্যতিক্রমী জীবনযাপন, জীবনের নানাক্ষেত্রে অনমনীয় লড়াকু মনোভাব, তজ্জনিত দারিদ্র্য, রোগ ও নেশা সব মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক নাটকের নায়ক। তারপর অনেক বছর পার হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের লোকেরা তাঁর সেই প্রোজ্বল ভাবমূর্তিটির সঙ্গে পরিচিত নয়। তাছাড়া উত্তরজীবনে যে মার্কসবাদের কাছে তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন সেই মতবাদও আর পাঁচটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মতবাদের মতই আজ সমালোচনার অধীন। তাকে এখন কেউ আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মত স্বত : সিদ্ধ মনে করে না (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় করতেন)। গত অর্ধশতাব্দীতে পৃথিবীর ভাবনাচিন্তার মানচিত্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, হয়েই চলেছে। এরই ভেতর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পার হল। তার আগেই পার হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর; প্রায় অগোচরে শেষ হয়ে গেছে তাঁর রচনার কপিরাইট পর্ব। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে যুগপৎ এই দুই ঘটনাতেও বাংলার সাহিত্যসমাজে তেমন চাঞ্চল্য জাগল না। দু চারটি লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন ক্রোড়পত্র বা শীর্ণকায় সংখ্যা বের করেছে। দু চারটি সংস্থা আনুষ্ঠানিক জন্মশতবর্ষ পালন করেছে। এইমাত্র। কিন্তু না বেরোলে তাঁর কোনো প্রামান্য জীবনী, না বেরোলো কোনো মূল্যবান স্মরণিকা। এমন কি তাঁর রচনাবলীর নানা ধরনের গ্রন্থনা ও সংস্করণ, যা কপিরাইট শেষ হলে অনেক লেখকেরই হয়েছে, তাও দেখা গেল না। তবে কি ধরে নেব একালের পাঠক তাঁর রচনার মূল্য বোঝে না। বা মানিক এখন তাঁর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছেন। তিনি কী উপেক্ষিত? তাও তো নয়! চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে একটা সময়ে কমিউনিস্ট সংশ্রবের কারণে বড় বড় পত্রপত্রিকার দরজা তাঁর কাছে বন্ধ হয়েছিল বটে , কিন্তু পরবর্তীকালে ইতিহাস বদলেছে। স্কুল কলেজ সবস্তরে তাঁর রচনা পাঠ্যতালিকায় স্থান পেল। ছাত্রপাঠ্য সমালোচনার বই লেখা হল রাশি রাশি। কিন্তু যুগান্তর চক্রবর্তী সহ দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁকে নিয়ে পরিণত চর্চা বিশেষ হল না।

আদিপর্ব

কোনো মানুষকে জানতে গেলে তাঁর দেশ কাল পরিচয়ের খবর নিতে হয়। আধুনিক জীবনীরচনার সেটাই রীতি। মানিকের বিষয়ে এই সব খবর কতটুকু পাওয়া যায় দেখা যাক। তাঁর আসল নাম ছিল প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক ডাকনাম বা ছদ্মনাম। ১৯০৮ সালের (মতান্তরে ১৯১০) ১৯ মে সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে তাঁর জন্ম হয়। জন্মস্থান দুমকা হলেও তাঁদের আদি নিবাস ওখানে ছিল না। তা ছিল বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রামে। তাঁর বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় সেখান থেকে শিক্ষা ও চাকরিসূত্রে অন্যত্র চলে আসার পর আর সেখানে ফিরে যাননি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চাকুরিজীবী বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের জীবনে এ ছিল এক অতি সাধারণ ঘটনা। এঁদের মধ্যে যাঁদের গ্রামে ভূসম্পত্তি ছিল, প্রতিষ্ঠা ছিল (যেমন নিরদ সি চৌধুরী পরিবারে) তাঁদের সঙ্গে গ্রামে দেশের বাড়ির একটা শিকড়ের যোগ রয়ে যেতো। পালেপার্বনে ক্রিয়াকর্মে যাতায়াত থাকতো। কিন্তু যাঁরা সে অর্থে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না তাঁরা যখন দেশ ছাড়তেন একেবারেই ছাড়তেন। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরষ বা পরিবারবর্গের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। হয়তো তাঁরা সে অর্থে প্রতিষ্ঠিতও ছিলেন না। অন্তত : দেশ ছেড়ে আসার পর তিনি সেখানে ফিরতে চেয়েছেন এমন ঘটনা আমরা দেখি না। যখন সেখানে চাকরিস্থল সেখানেই থেকেছেন সপরিবারে। একেবারে শেষ জীবনে একটি স্থায়ী ঘরের আশায় তিনি কলকাতার টালিগঞ্জে একখানি বাড়ি করেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক অবনিবনায় সেখানে বেশিদিন থাকতে পারেন নি। তাঁর শেষ জীবন কেটেছিল মানিকের সঙ্গে টালার এক ভাড়াবাড়িতে, একতলার সংকীর্ণ পরিসরে ছেলের সঙ্গে ঘোর দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তা ভাগ করে নিয়ে। এই শিকড়হীন অনিকেত জীবন মানিকের দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম উপাদান সন্দেহ নেই।

শুধু এটুকুই নয়, মানিকের শৈশব আরও অনেক দিনক দিয়েই ছিল অস্থির ও এলোমেলো। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার শেষের দিকের সন্তান, চৌদ্দ ভাইবোনের একজন। তাঁর বাবা খুব বড় চাকরি করতেন না। সারা জীবন ধরে বাংলার দূর দূর মফ:স্বলে ঘুরে ঘুরে চাকরি করতে করতে তিনি এই বৃহৎ পরিবারটিকে শুধু যথাসম্ভব ভালোভাবে চালাতে চেয়েছিলেন। ছেলেদের ভালো করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। লেখাপড়া শিখে তারা অনেকেই ভালো চাকরি বাকরি করে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মেয়েদের যথাযোগ্য পাত্রস্থ করেছেন। প্রৌঢ় বয়সে সহ্য করতে হয়েছে স্ত্রী বিয়োগের দুঃখ। অবশেষে মানিক যখন বড় হয়ে উঠছেন তখন তিনি নানাদিক দিয়ে সংসারসংগ্রামে ক্লিষ্ট ও অবসন্ন একজন প্রায় বাতিল মানুষ। পুরো পরিবারটিকে চালনা করবার দিন তাঁর শেষ হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত ছেলেরাই তখন সংসারের কর্তা। এখানে পরিবারবন্ধনের ভিতরের চেহারাটা কেমন ছিল, কার সঙ্গে মানিকের কিরকম সম্পর্ক ছিল তা আমরা জানতে পারি না। প্রচলিত জীবনীগুলিতে কেবল দেখি সবাই একযোগে প্রমাণ করতে নেমে পড়েছেন মানিক কতটা অসাধারণ ছিলেন সেটাই দেখাতে। তিনি যে নিতান্ত শিশু বয়সেও কখনো কাঁদতেন না। ডাক্তারের ছুরির নিচেও চুব করে ব্যথা সহ্য করতেন, অসম্ভব ডানপিটে ছিলেন, অবাধ্য ছিলেন, যখন তখন বেরিয়ে যেতেন বাড়ি থেকে। অকুণ্ঠভাবে মিশতেন মাঝি মাল্লা শ্রমিক ঘরের ছেলেদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে রাতও কাটাতেন। এইসব কার্যকলাপের বিবরণ দিয়ে তাঁকে খানিকটা সুপার হিরোর চেহারা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি কেন এরকম করতেন? কেন তাঁর মনের মধ্যে অল্পবয়স থেকেই মানবসম্পর্কের স্থায়িত্বে ও মাধুর্যে অবিশ্বাস জন্মেছিল, মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে কেন তাঁর মনে এত তিক্ততা তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

শিক্ষাদীক্ষা

নিজের শিক্ষা সম্বন্ধে মানিক এক জায়গায় লিখেছিলেন ''সারা বাংলায় ছড়ানো গোটা দশেক স্কুলে, আর মফঃস্বল ও কলকাতার গোটা তিনেক কলেজে আমি পড়েছি (গল্প লেখার গল্প : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)। প্রচলিত জীবনী থেকে এতগুলি স্কুল কলেজের খবর অবশ্য পাওয়া যায় না। তবে অনেক স্কুলে তিনি ঘুরে ঘুরে লেখাপড়া করেছিলেন এটা দেখতে পাই। তাঁর প্রথম শিক্ষা সুরু হয় কলকাতার মিত্র ইন্‌স্‌টিউশনে। তাঁর বড়দা তখন কলকাতায় চাকরি করতেন। বড়দার কাছে থেকেই তিনি স্কুলে ভরতি হন। এই স্কুলে তিনি বছর পাঁচ ছয় পড়েছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন মেধাবী ও মনোযোগী। এক সময় তাঁর দাদা অন্য চাকরি নিয়ে দূরে চলে গেলে মানিক

মধ্যপথে মিত্র ইন্‌স্‌টিটিউশন ছেড়ে চলে গেলেন বাবার কর্মস্থল টাঙ্গাইলে, এবং ভর্তি হলেন সেখানকারই স্কুলে। তখনকার দিনে টাঙ্গাইল ছিল ময়মনসিংহ জেলার একটি গন্ডগ্রাম এবং ম্যালেরিয়াপ্রবণ অস্বাস্থ্যকর এলাকা। ওখানে যাবার অল্পদিন পরেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রান্ত হলেন ম্যালেরিয়ায়। লেখাপড়ায় ছেদ পড়তে লাগল বড় বড়। বাড়িতে সঙ্গী বলতে ছিল কয়েকটি ছোট ছোট ভাইবোন। এই নিস্তরঙ্গ পারিবারিক পরিবেশে প্রবল স্বভাব সম্পন্ন মানিকের মন ভরত না। এই পর্বেই তিনি প্রথম কারও কথা না শুনে বাড়ি থেকে মাঝে উধাও হতে এবং ইচ্ছামত সঙ্গী নির্বাচন করে তাদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেন। ওখানে নদীর ধারে মাঝি মাল্লাদের নৌকা বাঁধা থাকত। মানিকের প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল সেখানকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পরিচয় পরে আমরা পেয়েছি পদ্মানদীর মাঝিতে। ভাবতে অবাক লাগে যে মাত্রই তের চৌদ্দ বছর বয়সে, সপ্তম শ্রেণীতে পড়তে পড়তে সেই বাল্যকালেই কতখানি তীক্ষ্ণভাবে তিনি এদের জীবনযাত্রা দেখে নিয়েছিলেন।

১৯২২ সালে তাঁর মা নীরদাসুন্দরী দেবী মারা গেলেন। মানিক তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। পত্নীবিয়োগের পর মানিকের বাবা টাঙ্গাইলের বাস উঠিয়ে পুরো পরিবারটিকে নিয়ে চলে এলেন মেদিনীপুরের কাঁথিতে। সেখানে তখন তাঁর মেজ ছেলে সন্তোষ ডাক্তারি পাশ করে সদ্য প্র্যাকটিশ আরম্ভ করেছে। এখানে এসে মানিককে কাঁথি মডেল হাই স্কুলে ভরতি করা হোল। দুর্ভাগ্যবশত : এ স্কুলও তাঁর ভাগ্যে স্থায়ী হল না, কারণ অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আক্রান্ত হলেন কালাজ্বরে। পড়া বন্ধ হয়ে গেল। অভিভাবকেরা দেখলেন গ্রামের জলহাওয়ায় মানিকেরা শরীর ভাল থাকছে না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা চিন্তা ভাবনা করে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন মেদিনিপুর সদর শহরে। সেখানে তখন তাঁর বড়দি থাকতেন। এখানে এসে তাঁর অসুখ সারল। তখন তাঁকে ভরতি করা হল মেদিনিপুর জেলা স্কুলে। এখান থেকেই তিনি ১৯২৬ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করলেন।

বিদ্যাশিক্ষার এই ইতিহাসই বলে দিচ্ছে মানিকের শৈশব কতটা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কেটেছিল। জ্ঞানোদয়ের পরে মানব সন্তান তার নিজ পরিবারের স্নেহাশ্রয়ে দাঁড়িয়ে তবেই বাইরের জগতের সঙ্গে মোকাবিলা শুরু করে। মানিকের জীবনে সেই দাঁড়াবার জায়গাটাই বার বার বদলে গেছে। বিশেষ কোনো একটা জায়গার নিসর্গ, মানুষজন, পরিবেশ, পরিজন, বিদ্যালয়, বন্ধুবান্ধব এসবের মধ্য থেকে বাইরের জগতকে ধীরে ধীরে চিনে নেবার সুযোগ তিনি পান নি। ক্রমাগত একটা ঘাট থেকে আরেক ঘাটে ঘুরতে ঘুরেত তাঁর অভিভাবকরাও ক্রমাগত বদলে গেছেন। বদলির চাকরি নিয়ে যাঁদের ছেলেপুলে সহ ঠাঁই বদল করতে হয় এটা তা নয়। সেখানে পরিবারটা একই থাকে। এখানে থাকে নি। অভিভাবক হিসাবে বাবা মা, বড়ভাই, মেজভাই, দিদি প্রত্যেকেই তাঁকে যত্ন করেছেন ঠিকই, কিন্তু অনুমান করলে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না যে এদের পারিবারিক পরিবেশ, ছেলেপুলে মানুষ করবার প্রণালী, ধরণধারণ ও মূল্যবোধ নিশ্চয়ই একরকম ছিল না। কোন ঘরটিকে মানিক তাঁর নিজের ঘর মনে করবেন। কার কাছে তাঁর অনুভূতিপ্রবণ বালকচিত্ত নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হয়ে থাকবে তাঁর কোনো স্থিরতা নেই। এই অবস্থায় কোনো বালক যদি সকলের শিক্ষাই প্রত্যাখ্যান করে, অবাধ্য ও উগ্র হয়ে ওঠে, নিজের খেয়ালকেই ধ্রুবসত্য মনে করে, এবং এইবাবেই তৈরি করে নেয় নিজের ব্যক্তিত্ব, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বিশেষ করে মানিকের মত লোক, যার চরিত্রে অস্মিতা অতিশয় প্রবল।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পর মানিককে ভর্তি করা হল বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজে। এখানে তিনি আই এস সি কোর্সে ভর্তি হন। থাকতেন হাস্টেলে। এই কলেজের দু বছর কাল সময়ই সম্ভবত : মানিকের সারা ছাত্রজীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। লেখাপড়া করতে তাঁর ভালো লাগত, মন দিয়ে বিজ্ঞান পড়তেন এবং ভাবতেন ভবিষ্যতে বড় বৈজ্ঞানিক হবেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মকথা থেকে জানা যায় নানারকমের পাঠ্যাতিরিক্ত বইও তিনি তখন পড়েছেন, যার মধ্যে দেশি বিদেশি সাহিত্য গ্রন্থও প্রচুর আছে। নানারকম গল্প পড়তে পড়তে কখনও বা ভেবেছেন যদি লেখক হওয়া যেত। চিন্তা করেছেন লেখক হতেও পারি। তবে এক্ষুনি নয়। আগে লেখাপড়া শেষ হোক, জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়ুক। তিরিশ বছর বয়স হোক, তখন না হয় লেখক হওয়া যাবে। এই পর্বে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব হয়েছে দু চারজন; এবং সবচেয়ে বড় কথা এমন শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসেছেন যাঁকে সর্বান্তকরনে শ্রদ্ধা করা যায়। এ সবই জীবনের ইতিবাচক দিক। অবশ্য খারাপ দিকও একেবারে ছিল না তা নয়। হস্টেল জীবনের স্বাধীনতার সুযোগে তিনি লুকিয়ে চুরিয়ে নিয়ম ভেঙেছেন। অল্পস্বল্প উচ্ছৃঙ্খলতা ও নেশার স্বাদ নিয়েছেন। তবে তা ছিল মাত্রার মধ্যে। তাঁর বড় ক্ষতি কিছু হয় নি। ১৯২৮ সালে আই এস সি পরীক্ষায় তিনি খুব ভালো ফল করলেন। অভিভাবকেরা খুশি হয়ে তাঁকে ভর্তি করে ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। অঙ্কে অনার্স নিয়ে, ছাত্রাবাসে থেকে তিনি শুরু করলেন বি এসসির পড়া।

কিন্তু বি এস সি পাশ করা তাঁর আর হল না। এ বছরেই বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে বিচিত্রায় তাঁর অতসী মামী গল্প বেরোলো। আর তারপর থেকেই আমূল বদলে গেল তাঁর জীবনের ধারা। তখন তাঁর মাত্রই কুড়ি বছর বয়স। একটা দুটো মাত্র গল্প সাময়িক পত্রে বেরিয়েছে। এক মূহূর্তেই তিনি নিজ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিয়ে নিলেন। তিনি লেখক হবেন, এবং শুধুই লেখক হবেন অন্য কোনো কাজে তিনি আর মন দিতে পারলেন না। পড়াশোনায় তো নয়ই। এ সিদ্ধান্তে গুরুজনেরা অবশ্যই খুশি হন নি। তাঁরা তাঁকে লেখাপড়াটা আগে শেষ করে তারপর লেখায় হাত দিতে বলেছিলেন। মানিক তা করতে পারেন নি। চেষ্টা করেও পারেন নি। অভিভাবকদের নির্বন্ধে তিনি বি এস সি পরীক্ষা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পাশ করতে পারেন নি। তাঁর মন তখন অন্যত্র সরে গেছে। তাঁর প্রথাগত শিক্ষার এখানেই সমাপ্তি।

সাহিত্যগুরু

একটি মাত্র গল্প লিখেই সাহিত্যিকের স্বীকৃতিলাভ খুব দুর্লভ ঘটনা। অসাধারণ প্রতিভা ব্যতীত এমনটা হতে পারে না। সে প্রতিভা মানিকের ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিভারও একটা গতিপথ আছে। এমনিতে তা আকাটা হিরের মত। চর্চার দ্বারা তাকে উজ্জ্বল করতে হয়। সচেতন প্রয়াস ব্যতীত তা সম্ভব হয় না। মানিক যে হঠাৎ লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন তার পিছনেও নিশ্চয়ই কোনো না কোনোরকম একটা চর্চার ইতিহাস ছিল। তিনি ইতিপূর্বে কোনো গল্প উপন্যাস লেখেননি হয়ত, কিন্তু পড়েছিলেন বিস্তর। নিজের সম্বন্ধে যে দুটি ক্ষুদ্র ফরমাসি পুস্তিকা তিনি লিখেছিলেন একমাত্র সেখান থেকেই তাঁর সাহিত্যরুচি ও পাঠাভ্যাসের খবরাখবর সংগ্রহ করা সম্ভব, আর কোনো উৎস নেই। যাই হোক সেই পুস্তিকার সাক্ষ্যেই জানতে পারি বই পড়বার অভ্যাস ছিল তাঁর অল্প বয়স থেকেই, সম্ভবত : স্কুলের উচুঁ ক্লাশে পড়বার সময় থেকে। যে লেখক তাঁর মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কাটতে পেরেছিলেন তিনি হলেন শরৎচন্দ্র। চরিত্রহীন বইখানা তিনি বার বার পড়েছিলেন, এবং তাঁর মনের অনেক গোড়াঁমি তাতে কেটে গিয়েছিল। তাই বলে শরৎচন্দ্রকে তিনি অন্ধভাবে

গ্রহণ করেন নি, সমালোচনার ভাবও ছিল খানিকটা । তাঁর মনে হত শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের যে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শরৎচন্দ্র লিখেছেন তা যেন সত্য নয়। অনেকটাই বানিয়ে বলা। তুলনায় রাজলক্ষী অনেক বাস্তব। সে যেন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের সেবাময়ী স্নেহময়ী রসময়ী নারীত্বের প্রতিমূর্তি। গৃহের সংকীর্নতা থেকে বেরিয়ে এসেছে বলেই তার প্রেমকে নতুন রকম মনে হচ্ছে। তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসের চরিত্রশালায় হৃদয়বেগের এত প্রাধান্য কেন? কেনই বা প্রেমের ছবি আঁকবার সময় দেহকে তিনি এড়িয়ে চলেন। বলা বাহুল্য এই ধরনের সাহিত্যজিজ্ঞাসায় তাঁর পরিণত মনেরই পরিচয় মেলে। কিন্তু শরৎসাহিত্যই তো বাংলা সাহিত্যের সব নয়। আর কাদের বই তিনি পড়েছিলেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট খবর আমরা পাই না। বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ তিনি কোথাও করেন নি। করবার কথাও নয়, কারণ তাঁদের চিত্তপ্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখও যৎসামান্য। কবি বলে তিনি তাঁকে হিসাবের বাইরে রেখেছিলেন একথা খাটে না, কারণ রবীন্দ্রনাথ শুধুই কবি নন।। ১৯২৬ - ২৮ সালে বাংলাদেশে কোনো সাহিত্যমনস্ক শিক্ষিত যুবকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে ভাবনাচিন্তা করা সম্ভব ছিল না। গ্রহণ বা বর্জন যে পথেই হোক না কেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অলঙ্ঘনীয়। মানিক কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা বলেন নি। সাহিত্যে বাস্তবতা এবং প্রেমে দেহের ভূমিকা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তখন চর্চা শুরু হয়ে গেছে। কল্লোল কালিকলম প্রভৃতি পত্রিকা নিয়ে মানিকের কাছাকাছি বয়সের যুবকেরা সাহিত্যের আসরে হৈ হৈ করে নেমে পড়েছেন। মানিক বয়সে এঁদের চেয়ে সামান্য ছোটো হলেও কাছাকাছি। তাদের আসরেও তাঁর যাতায়াত ছিল না , কিন্তু এদের রচনা তিনি পড়েছিলেন। তাঁর নিজের গল্প বলার টেকনিক এবং রচনার বিষয় বস্তু, বিশেষত : ফ্রয়েডিয় মনোবিকলনের দিকে ঝোঁক প্রমাণ করে যে সমসাময়িক সাহিত্যের ধারাগুলি তাঁর অপরিচিত ছিল না। কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য তিনি করেছেন তা আমাদের বিভ্রান্ত করে। কারও নাম না করে সাধারণভাবে নবীন সাহিত্যসেবীদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে এদের লেখা পড়েন— ভাষার তীক্ষ্ণতা, ভঙ্গির নূতনত্ব, পরিবেশ বাস্তবতার দিকে দুঃসাহসী আগ্রহ তাঁর মনে নতুন সাহিত্য সম্বন্ধে আশা জাগায়, কিন্তু এরই পাশাপাশি এঁদের রচনার ''হালকা, নোংরা, রোমান্টিক ন্যাকামি'' তাঁর মনে বিতৃষ্ণা জাগায়। আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে মানিকের সঙ্গে সমকালে, প্রায় একই বছরে আর যে দুজন দিকপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর চারিদিকে আলোড়ন তুলে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন তাঁদের রচনাও কি তিনি পড়েন নি। এঁদের রচনাকেও কি তাঁর ''হালকা, নোংরা, রোমান্টিক ন্যাকামি'' মনে হয়েছে? তা তো কোনোমতেই সম্ভব নয়।

বিদেশি লেখকদের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন হামসুন ও গোর্কির কথা। গোর্কির 'মাদার' তাঁকে অভিভূত করেছিল একথা বার বার বলেছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য শুধু হামসুন আর গোর্কিকে নিয়েই তৈরি হয় নি। তার একাট বিশাল ক্লাসিকাল ভাণ্ডার আছে। তদুপরি ঠিক ঐ সময়টায় প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যভূমিতে একটা প্রবল টানাপোড়েন চলছিল। সেখানকার বিক্ষুব্ধ চিত্তভূমি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন আমাদের দেশের সাহিত্যিকরাও। মানিক সেভাবে সমসাময়িক পাশ্চাত্য সাহিত্যের খবর রেখেছেন এমন কোনও প্রমাণ আমরা পাই না। যেটা তিনি খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন তা হল ফ্রয়েডিয় মনোবিজ্ঞান। সব মিলিয়ে মনে হয় দেশি বা বিদেশি পূর্বসূরী বা সমকালীন সাহিত্যিকদের বই তিনি খুব বেশি মন দিয়ে পড়েন নি, পড়বার পরিবেশ ও মানসিকতা তাঁর জীবনে কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু যেটুকু পড়েছিলেন তার থেকেই অসাধারণ ধীশক্তির বলে তুলেনিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষনীয় উপাদানগুলি। তাই যখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিলেন একেবারে পূর্ণ পরিণত হয়েই দেখা দিলেন। তাঁর কোনো শিক্ষানবিশি পর্ব নেই। এবং সেটাই হয়তো তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

আত্মকথা/ জীবনকথা

জীবনের নানা ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তিরা অনেকেই আত্মজীবনী লিখেছেন। এই আত্মজীবনীগুলির একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল প্রায় প্রত্যেকেই জোর দিয়েছেন নিজ নিজ প্রতিভার উন্মেষ পর্বটির দিকে। একজন মানুষ ভবিষ্যতে যা কিছু হয়, বা যা কিছু করে তার বীজ পোঁতা হয় শৈশবে। তার দেহমন ও দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হয় যে সব উপাদানে তাদের মূল প্রোথিত তাকে দেশ কাল পরিবারের ইতিহাসে, যেটা পরবতীকালের জানার কথা নয়। সেইজন্য দেখা যায় অনেক আত্মকথাতেই লেখকেরা তাঁদের প্রথম জীবনের ইতিহাসটি বর্ণনা করে পরবর্তী অংশে আর এগোনোর প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিদ্যাসাগর তাঁর স্বরচিত জীবনবৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে বিস্তারিতভাবে বলেছিলেন পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের কথা, কারণ বিদ্যাসাগর চরিত্রের তেজ জেদ ও আত্মসম্মান বোধ এই লোকটি থেকেই পাওয়া। তারপর তিনি বর্ননা করেছেন নিজ পিতার জীবন সংগ্রাম, তাঁর নিজের কলকাতায় আসা এবং সংস্কৃত কলেজে ভরতি হয়ে বিদ্যাশিক্ষা সুরু করা পর্যন্ত। এর পরের কথা আর তিনি লেখেন নি, কারণ সে অংশ সকলের জানা। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি লিখেছিলেন পঞ্চাশ পার করে। কিন্তু - তাঁর পরিবার, পরিবেশ, সঙ্গীসাথী, শিক্ষাদীক্ষা, কাব্যরচনার সূত্রপাত, এবং তারপর কড়ি ও কোমল রচনা পর্যন্ত ইতিবৃত্ত। তাঁর মতে এখন থেকে তিনি পরিণত শক্তির কবি, এখন থেকে তাঁর কাব্য 'মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।'' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যয়ের যুগ্ম রচনা আমার কালের কথা, এবং আমার সাহিত্যজীবন তাঁর দেশ কাল পরিবার এবং সাহিত্যসাধনায় প্রাথনিক সাফল্য ও বার্থতার কাহিনি। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন আমার শৈশব, এবং আমার যৌবন। সত্যজিৎ রায় লিখেছেন যখন ছোট ছিলাম। আবার ব্যতিক্রমী আত্মকথা লিখেছেন সজনীকান্ত দাস। কিন্তু তাঁর আত্মস্মৃতি যত না তাঁর নিজের কথা তার চেয়ে অনেক বেশি আছে সমকালীন সাহিত্য আন্দোলনগুলির ইতিহাসে। সেখানে নিজের কথার চেয়ে অন্যের কথাই বেশি আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের কারো মত কোনো আত্মজীবনী লেখেন নি।

কখনও কখনও লেখকেরা সোজাসুজি আত্মকথা না লিখেও এমন কোনো গল্প উপন্যাস লেখেন যেখানে আধা কাল্পনিক কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে তাঁদের নিজের জীবনটাই উঠে আসে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালি ও অপরাজিত, এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাত্রীদেবতা এই শ্রেণীর বই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কোনো বই লেখেননি যার মধ্যে তাঁকে স্পষ্টভাবে ধরতে ছুঁতে পারা যায়। অসংখ্য চরিত্রের আড়ালে খণ্ড খণ্ড করে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন, কোথাও পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করেন নি।

আর এক রকমের উপন্যাস (বা নাটক) আছে যেখানে কোনও বিখ্যাত লোককে অবলম্বন করে সত্য মিথ্যায় মিশিয়ে, গল্প খাড়া করা হয়েছে। কখনও তাঁদের আসল নাম দেওয়া হয়। কখনও হয় না। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য থাকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির সত্য স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। বাংলা ভাষায় বনফুলের শ্রীমধুসূদন নাটক এর দৃষ্টান্ত। অথবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই সময় উপন্যাসটিও ধরা যেতে পারে।

নায়ক নবীনকুমার আপাতদৃষ্টিতে কাল্পনিক চরিত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে উনবিংশ শতকের প্রবাদপুরুষ কালিপ্রসন্ন সিংহ। রোমাঁ রোলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ আসলে বিঠোভেন। আবার আরভিং স্টোন সোজাসুজিই ভিনসেন্ট ভ্যান গগকে নিয়ে তাঁর 'লাস্ট ফর লাইফ' লিখেছিলেন। সমরেশ বসুর অসমাপ্ত রচনা 'দেখি নাই ফিরে' এইরকমের ই এক রচনা যেখানে নায়ক স্বয়ং রামকিঙ্কর বেইজ। মানিকের জীবন ও কর্ম নাটকীয় উপাদানে ঠাসা ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোনো বাঙ্গালী ঔপান্যাসিক আজ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে গল্প লেখবার চেষ্টা করেন নি।

লেখকজীবন।।

১৯২৮ সালে বিচিত্রায় অতসীমামী গল্পটি বের হবার সঙ্গে সঙ্গে মানিক রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তখন তাঁর মাত্র কুড়ি বছর বয়স। ঐ বয়সেই কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়া, এবং কারও কথা না শুনেই তিনি নিজ জীবনের সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিয়েনিলেন। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে গ্রহণ করলেন চব্বিশ ঘন্টার লেখকজীবন। পরবর্তী আঠাশ বছর ধরে আমৃত্যু তিনি এই সংকল্প রক্ষা করেছেন। উপার্জনের তাগিদে দু একবার অন্য কাজ করতে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে টিকতে পারেন নি। তাঁর জীবনের সে সব ইতিহাস মোটামুটি সকলের জানা আছে। আঠাশ বছরব্যাপী এই সাহিত্যজীবনের কতগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। সংক্ষেপে সেগুলি এইরকম।—

(১) মানিক যখন লেখক জীবন শুরু করলেন তখনই তাঁর মন বুদ্ধি দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে। যে দৃষ্টিভঙ্গী তথাকথিত সত্য শিব সুন্দরে বিশ্বাস নয় আদৌ। সজনীকান্ত দাসের ভাষায় তাঁর ছিল 'পোক্ত' মন, এবং দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 'কুটিল, জটিল, অসাধারণ'। প্রবৃত্তিতাড়িত তুচ্ছ প্রাণী হিসাবেই তিনি মানুষকে দেখতেন, জানতেন সে নিয়তির হাতে খেলার পুতুল। এই দিক দিয়ে অগ্রজ জগদীশ গুপ্ত এবং জীবনানন্দ দাশের (গল্পলেখক) সঙ্গে তাঁর মিল আছে। যদিও জগদীশ গুপ্তের লেখা তিনি সম্ভবত : পড়েন নি, এবং জীবনানন্দ দাশ যে গদ্যও লেখেন তা তখন কেউ জানতো না।

(২) লাভ লোকসান বিবেচনা করে তিনি কখনও সিদ্ধান্ত নিতেন না। দ্বিধা দ্বন্দ্ব তাঁর স্বভাববহির্ভূত ছিল। তিনি মুহূর্তমধ্যে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। এবং তার পরবর্তী দায় অক্লেশে, অনুশোচনা রহিত ভাবে বহন করতেন। (এ বিষয়ে বাংলাসাহিত্যের আর এক নায়ক মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে তাঁর মিল আছে।) মূল্যবোধের সঙ্গে তিনি কখনো আপোষ করতেন না। সেজন্য চিরকাল ঘোর দারিদ্র্যে কাটিয়েছেন। পরে রোগ ও নেশায় জর্জরিত হয়েছেন। কিন্তু হার স্বীকার করেন নি।

(৩) তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির সিংহভাগ প্রথম জীবনে লেখা। কুড়ি থেকে সাতাশ আটাশ বছর বয়সের মধ্যে তাঁর জীবনের সবচেয়ে সৃজনশীল পর্ব পার হয়েছিল। তখন তিনি ঝড়ের বেগে লিখেছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর শরীর বলে একটা জিনিস আছে। এ পর্বের শেষের দিকে তিনি প্রথম মৃগীরোগে আক্রান্ত হন। লেখার দুরন্ত গতিতে একটা ছেদ পড়ে। তারপর তিনি বিবাহ করে সংসারী হন, সন্তানের পিতাও হন। কিন্তু একমাত্র লেখার আয়েই তাঁদের সংসার চলত বলে অবিশ্রাম লেখনীচালনা তাঁকে চিরকাল করতে হয়েছে।

(৪) চল্লিশের দশকে তিনি মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হন এবং কমিউনিস্ট পাটিতে যোগ দেন। সাহিত্য হল শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার, তার আর অন্য কোনো মূল্য নেই এই তত্বে তিনি বিশ্বাস করতে থাকেন। এবং তদনুযায়ী তাঁর গল্প উপন্যাসের ছকগুলি তৈরি হয়ে যায়। ফলে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি আর ব্যক্তিচরিত্র না থেকে হয়ে যায় খানিকটা শ্রেণীচরিত্র। ভালোমন্দের সাদাকালো বিভাগটি খুব স্পষ্ট হয়। রচনার এই সরলীকরণে বক্তব্যের জোর বেড়েছে হয়তো, কিন্তু লেখার ধার কমে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। অন্য অল্প শক্তিমান লেখকের হাতে এরকম রচনা হয়তো প্রচার পত্রের চেহারা নিত। তবে এখানে লেখক যেহেতু অসীম প্রতিভাবান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই গল্প উপন্যাসগুলির ভরাডুবি হয় নি। কোনো কোনো রচনা সাহিত্যগুনেও অত্যুৎকৃষ্ট।

(৫) এই নতুন রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কর্ম হয়তো ব্যক্তিগত স্তরে মানিকের উপকারই করেছিল। কারণ এতদিন পর্যন্ত যে সর্বব্যাপ্ত নিখিল নাস্তিবোধের জগতে তিনি বিচরণ করতেন, সেখানে মানুষ বেশিদিন থাকতে পারে না। সুস্থ থাকতে গেলে তাকে কোনো না কোনো বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড়াতেই হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপের উদ্‌ভ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ সাহিত্যিকেরা অনেকেই এভাবে মার্কসবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কেউ বা আশ্রয় নিয়েছিলেন ক্যাথলিক ধর্মে। উন্মাদও হয়ে গিয়েছিলেন কেউ কেউ। মানিকের মার্কসবাদকে ধ্রুবসত্য বলে গ্রহণ করা এবং নিজেকে সেখানে নিঃশেষে সমর্পণ করা এইরকমেরই প্রতিক্রিয়া কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

(৬) মানিকের শেষ জীবনের কিছু ডায়েরি থেকে পরে জানা গেছে মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকে তাঁর মধ্যে অলৌকিকে বিশ্বাস এসেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির অফিসিয়াল বিধি নিষেধের সঙ্গেও মাঝে মাঝে তাঁর মতভেদ হত। দুটো ব্যাপারই সত্য হতে পারে। কিন্তু এ সব যখন ঘটছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁচেছেন, লেখকজীবন প্রায় শেষ, নিয়তির মারে তিনি তখন সব দিক দিয়েই জর্জরিত। তাই বর্তমান প্রসঙ্গে সেই সব দুঃখজনক খবর অনালোচিত থাকলে ক্ষতি কি?